জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ISSN 2519-5816
ভলিউম-১৫, সংখ্যা-১ DOI : https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.87793
জানুয়ারি-জুন ২০২৫ Page: 75-90

বগুড়া জেলার লোকজ উৎসবে কৃষি-অর্থনীতির প্রভাব ও তাৎপর্য

মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান*

Abstract

Festivals related to harvest, arrival of new crops, agricultural production and marketing have been celebrated for a long time in agrarian societies. It has emerged that agricultural festivals are not only a means of entertainment; they also play a role as a driving force for the local economy. As like as farming community Bogra districts people also celebrate various folk festivals related to agriculture for ages. The study was conducted using a qualitative research method, where various documents, research articles and references were reviewed. The study revealed that 10 festivals of Bagura district such as Nababarsha, Nabanna, Paush Parvan, Poradaha Mela, Khauro Mela and Goyal Puja are directly related to agriculture. It can be said that initiatives need to be taken to maintain the connection between folk festivals and the agricultural economy. This tradition can be preserved and revived through the concerted efforts of local administration, culture-loving people and the farming community.

মুখ্যশব্দ: লোকজ উৎসব, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, কৃষি-অর্থনীতি, মেলা

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

উৎসব মানুষের আচরণ, জীবনাচার, আবেগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। উৎসব হলো সমাজের দর্পণ। উৎসব ব্যক্তিপর্যায়ে হতে পারে, সামাজিক পরিমণ্ডলে হতে পারে, একইভাবে জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে। মানুষ ব্যক্তিপর্যায়ে ভোজ, পারিবারিক পরিমণ্ডলে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ, উপার্জনের আদি মাধ্যম কৃষি ফসল উৎপাদন, শিকার, ইত্যাদিতে যে অনুষ্ঠান করে তাই লোকজ উৎসব। অর্থাৎ, উৎসব যখন কোনো সামাজিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় রীতির অধীন না হয়ে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনাচার হিসেবে প্রতীয়মান হয়, তখন তা হয়ে ওঠে লোকজ উৎসব। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকজ উৎসব মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা থেকেই সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক রীতিতে পরিগণিত হলে তা সামাজিক উৎসবে রূপ লাভ করে। সামাজিক উৎসব যখন ধর্মীয় আচার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তা ধর্মীয় উৎসব। একইসাথে একটি জাতিসত্তার প্রতিটি মানুষ যে উৎসব পরিপালন করে তা জাতীয় উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ধরনের উৎসব থাকলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন আঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা লোকজ উৎসবগুলি মানুষের জীবনধারার সাথে গভীরভাবে জড়িত। বিশেষ করে কৃষি-অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজে এ ধরনের উৎসবগুলোর একটি স্বতন্ত্র রূপ বিদ্যমান। বগুড়া জেলা, যা কৃষিনির্ভর অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র, সেখানে কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকজ উৎসব যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। এসব উৎসব শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং কৃষি উৎপাদন, বিপণন, এবং কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি বহন করে। বর্তমান গবেষণাটি বগুড়া জেলার লোকজ উৎসবগুলোর সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্য উৎপাদন, ফসল সংগ্রহ, বৃষ্টিপাতের জন্য প্রার্থনা, খাদ্যসংস্কৃতি ইত্যাদি উপলক্ষে পালিত লোকজ উৎসবগুলো কৃষির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব উৎসবের ধরন, কৃষি-সম্পৃক্ততা এবং এর প্রভাবেও পরিবর্তন এসেছে। এ গবেষণার মাধ্যমে এসব উৎসবের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা কৃষির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অনুধাবনে সহায়ক হবে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বগুড়া জেলার বিভিন্ন লোকজ উৎসব ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক চিহ্নিত করা এবং সমাজের কৃষিনির্ভর শ্রেণির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বোঝানো। সর্বোপরি, এ গবেষণায় ফুটে উঠেছে যে, বগুড়া জেলার বিভিন্ন লোকজ উৎসবের সাথে বগুড়া জেলার জনগোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক জীবনের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র।

গবেষণা-জিজ্ঞাসা

বর্তমান গবেষণাটি নিম্নোক্ত দুটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে পরিচালিত হয়েছে-

১. বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উৎসবের মধ্যে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত উৎসবগুলো কী কী?
২. বগুড়া জেলার জনগোষ্ঠীর সাথে কৃষি-অর্থনীতিনির্ভর লোকজ উৎসবের সম্পর্কের অনুঘটক উপাদানসমূহ কী কী?

গবেষণা পদ্ধতি

'বগুড়া জেলার লোকজ উৎসবে কৃষি-অর্থনীতির প্রভাব ও তাৎপর্য' শীর্ষক গবেষণাটি একটি গুণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research)। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন অভিসন্দর্ভ, বই, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ, বিভিন্ন নথি থেকে আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis/Document Analysis) প্রয়োগ করে বিভিন্ন লোকজ উৎসবে কৃষিকাজ, ফসল, কৃষকের জীবনাচার, কৃষিপণ্য বিপণন, আয়-উপার্জন ইত্যাদি বিবেচনায় কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কিত লোকজ উৎসব চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত উৎসবগুলো কৃষি-অর্থনীতির উপাদানসমূহের সাথে সম্পর্ক পর্যালোচনায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসৃত হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষি কীভাবে সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসাথে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিবেচনায় লোকজ উৎসবে স্থানীয় জনগণ কৃষিকে কীভাবে সম্পৃক্ত করছে তারও সুস্পষ্ট যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা-উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণাটি বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতি তথা কৃষিজাত পণ্য, কৃষি-পণ্য নির্ভর খাদ্য, কৃষি-পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সাথে সম্পর্ক নির্ণয় এবং বগুড়া জেলার জনগোষ্ঠীর সথে কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর লোকজ উৎসবের সম্পর্কের অনুঘটক উপাদানসমূহ পর্যালোচনা করার নিমিত্ত পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব

বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্যসংগ্রহ, শস্যপ্রাপ্তি, বৃষ্টিপ্রার্থনা উপলক্ষে উৎসব; কৃষি-নির্ভর পূজা-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠানে ভোজন, ফল-ফসল সুরক্ষায় সৃষ্টিকর্তার আরাধনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি লক্ষণীয়, যা এ অঞ্চলের উৎসবের সাথে কৃষির সম্পর্ক প্রমাণ করে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বগুড়াও কৃষি-অর্থনীতির একটি অঞ্চল। কৃষি শুমারি ২০০৮ এ মোট খানা বিবেচনায় বগুড়া জেলার ৫৭% খানা কৃষির সাথে জড়িত এবং ২০১৯ এ মোট খানা বিবেচনায় বগুড়া জেলার ৫৩% খানা কৃষির সাথে জড়িত।[১] বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : বগুড়া* শীর্ষক গ্রন্থে বগুড়া জেলার লোকউৎসব নামে নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, চড়ক, রথযাত্রা, ইছলে সওয়াব উৎসব এবং লোকমেলা ও লোকাচারের বিবরণ রয়েছে। এ সকল উৎসবের বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে, বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসলে এর সাথে অনুঘটক হিসেবে কাজ করা কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক নিরূপণ করে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। অথচ, এ বিষয়টির আলোচনা এবং উৎসবের সাথে কৃষির সম্পর্ক তুলে ধরার মাধ্যমে কৃষিনির্ভর শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি আবেগ-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মানসিকতায় উন্নতি সম্ভব একই সাথে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি-কাঠামোয় সমাজিক উৎসবের সাথে এর সম্পর্কের ক্রমহ্রাসমান চিত্রকে ক্রমোন্নতির ধারায় পরিবর্তনেও সহায়ক বিধায় বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়।

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

উৎসব মানুষের আবেগ-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক যার সাথে অর্থনীতি ও জীবনাচারের সম্পর্ক ওতপ্রোত। বর্তমান গবেষণা-প্রশ্ন এবং গবেষণা সম্পর্কিত পাঠ হিসেবে সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়েছে, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : বগুড়া* শীর্ষক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে জেলার নামকরণ, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকউৎসব, লোকাচার, লোকনাট্য, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকখাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রযুক্তি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।[২] বিশেষত এ গ্রন্থের লোকউৎসব সম্পর্কিত বর্ণনা বর্তমান গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সৌমিত দে রায় রচিত *বাংলার উৎসব ও শ্যামা পোকা: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সাংস্কৃতিক কাহিনি* শীর্ষক প্রবন্ধে একটি পোকা কিভাবে মানুষের উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে, এর সাথে প্রচলিত মিথ এবং বাস্তবতারও সংমিশ্রণ রয়েছে তা ফুঠে উঠেছে এ প্রবন্ধে;[৩] এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে বর্তমান গবেষণা একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমিত সিদ্ধান্তটি হলো, বগুড়া জেলার উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতির প্রচলিত মিথ যেমন রয়েছে, তেমনি এর বাস্তবসম্মত কারণও রয়েছে।

মো. সালেহ মাহমুদ রচিত 'ভাত ও বাঙালি: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভাত' একটি শব্দ থেকে ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠার বিবরণ ফুটে উঠেছে। বিশেষত এ প্রবন্ধের 'ভাত উৎসব' অনুচ্ছেদটি বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পর্কিত, যাতে বাঙালির বিভিন্ন উৎসবের সাথে 'ভাত'-এর সম্পৃক্ততা তুলে ধরা হয়েছে।[৪]

শিপ্রা ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলার লোক উৎসব ও লোক খাদ্য' শীর্ষক অধ্যায়ের (Book Chapter) বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিভিন্ন খাদ্যের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।[৫]

মো. হাবিবুল্লাহ রচিত '*কৃষি-পরাশর*-এ প্রাচীন বাংলার কৃষি' শীর্ষক প্রবন্ধে চতুর্থ মতান্তরে একাদশ শতাব্দীতে লিখিত কৃষি পরাশর নামক সংস্কৃত বইয়ের ভাষ্যানুসারে বাঙলার কৃষি, কৃষক, কৃষিজাত পণ্য এবং এর সাথে তাদের জীবনাচারের সম্পর্কের বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে।[৬]

মো. মতিয়ার রহমান রচিত, 'বাংলা নববর্ষ : বাঙ্গালির সার্বজনীন জাতীয় উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের প্রভাবে সৃষ্ট বাংলা সনকে স্মরণে বাংলা নববর্ষ উৎসব ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আজ সামাজিক ও জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।[৭]

Rajat Gupta, Ishan Bakshi এবং Prashant Gautam রচিত 'Determining the Impact of Attributes of Haryanvi Festival Food on Tourist Attraction' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, একটি ভৌগোলিক এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও ঐ এলাকায় দর্শনার্থীদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে।[৮] যা বর্তমান গবেষণায় উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক থাকার একটি প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত।

Sri Najiyati ও অন্যান্য রচিত 'Social Investment Through A Collaborative Village Festival: The Case of Farmers' Village Festival in Jogjakarta' শীর্ষক

প্রবন্ধে লোকজ উৎসবের সাথে সামাজিক বিনিয়োগ তথা, সমাজের বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব কল্যাণ, বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, তথ্যের আদান-প্রদান ইত্যাদির সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে অনুমিত হয় যে, উৎসব নিছকই মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হলেও এর রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।[৯] তাই বগুড়া অঞ্চলের লোকজ উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্কও অনুমিত হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন লোকজ উৎসবকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করেছেন কিন্তু বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত লোকজ উৎসবসমূহের সাথে কৃষির সম্পৃক্ততা নিরূপণে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি, যা বর্তমান গবেষণা পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণায় ঘাটতি (Research Gap) হিসেবে বিবেচিত।

কার্যকরী সংজ্ঞায়ন

বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলোকে নিম্নে সংজ্ঞায়িত (Operational Definition) করা হলো-

উৎসব

উৎসব বলতে সাধারণত সামাজিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে পালিত আনন্দ অনুষ্ঠানকে বোঝায়। উৎসব হলো সমাজের দর্পণ।[১০] উৎসব আনন্দ প্রকাশ ও লাভের মাধ্যম, এক কথায় যাকে বলা যায় আনন্দানুষ্ঠান। উৎসব পরিবারকেন্দ্রিক হতে পারে, আবার ব্যাপকভাবে সমাজকেন্দ্রিকও হতে পারে। কালের বিবর্তনে এসব উৎসবের কোনোটির রূপ বদলায়, কোনোটি বিলুপ্ত হয়, আবার কোনোটি নতুন সৃষ্টি হয়। উৎসবসমূহের কোনোটিতে থাকে সমাজ ও জাতীয়তার ছাপ, কোনোটিতে ধর্মের ছাপ, আবার কোনোটিতে থাকে রাজনীতির ছাপ। তবে সব অনুষ্ঠানের মূলেই রয়েছে আনন্দ লাভ।[১১] উৎসবের মূল ভিত্তি এবং অধিকাংশ প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানই যৌথ কর্ম। মানুষের প্রধান কর্ম কৃষির সঙ্গেও যোগ ছিল অনেক অনুষ্ঠান বা উৎসবের এবং সেসব নিয়ন্ত্রিত হতো চান্দ্রমাস দ্বারা। প্রাচীনকালের কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, যা পরবর্তীকালে অনেক আনুষ্ঠানিক হয়ে ওঠায় তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারায়।[১২]

লোকজ উৎসব

একই ঐতিহ্যের ধারক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে 'লোক' বলে, যার ইংরেজি হলো Folk।[১৩] পারিভাষিকভাবে বলা যায় এটি হলো- "artistic communication in small groups" or as "unofficial culture." (একটি ছোট্ট জনগোষ্ঠীর শৈল্পিক আচরণ বা অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি)।[১৪] একইভাবে বলা যায়, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে তাদের লোক বলা হয়। লোকদের সংগঠিত আনন্দ উৎসব হলো লোক উৎসব।[১৫] লোকজ উৎসবের প্রচলন হয় মূলত ভোজ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রাচীনকালে শিকারকৃত পশুর মাংস একত্রে বসে ভোজন করা এবং নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান পালিত হতো। পরবর্তীকালে কৃষি ও পশুপালন স্তরে এসে এ উৎসব নতুন মাত্রা লাভ করে এবং বিভিন্ন সময়ে যুগের দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লোকউৎসবের সৃষ্টি হয়।[১৬] ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পর্যায়ে শুরু হওয়া এসকল উৎসব কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে সমাজ, ধর্ম এবং কখনো কখনো জাতীয় উৎসবেও পরিগণিত হয়। সর্বোপরি, লোক বা সাধারণ সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ

বিশেষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকেই বলা হয় লোক-উৎসব। এ উৎসব একই নামে বিভিন্ন অঞ্চলে হয় না সাধারণত, আবার একই নামে অনুষ্ঠিত হলেও প্রায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, ফলে স্ব স্ব আঞ্চলিক অথচ সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পরিচিতি ও অনুস্মৃতি এ ধরনের অনুষ্ঠনে লক্ষ করা যায়। বর্তমান গবেষণায় বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন উৎসব, লোকমেলা[১৭] ও লোকাচার[১৮] লোকজ উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কৃষি-অর্থনীতি

অর্থনীতির অন্যতম তিনটি উপাদান হলো- অসীম চাহিদা, সীমিত সম্পদ এবং সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার। অর্থনীতির এ উপাদানগুলোর আলোকে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা অর্জনে উৎপাদনের জন্য পণ্য বাছাই, পণ্য সংরক্ষণ, নতুন উপযোগ সৃষ্টি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদির আধুনিক নাম হলো কৃষি-অর্থনীতি। কৃষি-অর্থনীতির পরিধি উৎপাদন, ভোগ, মুনাফা, বণ্টন ইত্যাদির পাশাপাশি মানুষের জীবনপ্রণালি, আচরণ, ক্ষমতায়ন, সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। কৃষি-অর্থনীতি বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও কৃষি ও কৃষক সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করেছে, যা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়।[১৯] সুপ্রাচীন কাল থেকে কৃষি-ব্যবস্থাপনা ও কৃষক শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস বগুড়ার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বগুড়ায় কৃষি-অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব এ অঞ্চলের জনগণের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সমবায় খামার, কৃষক ইউনিয়ন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভূমি-সংস্কার, কৃষি কর, কৃষি ভর্তুকি, কৃষি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি পরিভাষা ও তত্ত্ব কৃষি-অর্থনীতির উপাদান হিসেবে সমাজকে প্রভাবিত করছে।[২০] বর্তমান গবেষণায় কৃষি-অর্থনীতি বলতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন, কৃষি বীজ, কৃষি জমি, কৃষক, কৃষিজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি-পণ্যের ভোক্তা, কৃষি-যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি কর-খাজনা ইত্যাদি বিবেচিত হয়েছে।

বগুড়া জেলা

বগুড়া বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ হলেও প্রশাসনিকভাবে ১৮২১ সালে সর্বপ্রথম তদানীন্তন রাজশাহী জেলার ৪টি থানা (আদমদীঘি, বগুড়া, শেরপুর ও নওখিল), দিনাজপুরের ৩টি থানা (লালবাজার, বদলগাছী ও ক্ষেতলাল) এবং রংপুরের ২টি থানাসহ (গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ) মোট নয়টি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়।[২১] পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে এ জেলার আয়তন ও সীমারেখা পরিবর্তিত হলেও জেলা হিসেবে এর ঐতিহ্য ও ইতিহাস অক্ষুণ্ন রয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এ জেলা বগুড়া ও জয়পুরহাট নামক দুটি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও পুনর্গঠন নীতির অধীনে বগুড়া জেলাকে বিভক্ত করে বগুড়া ও জয়পুরহাট নামে দুটি জেলা সৃষ্টি করা হয়।[২২] বর্তমানে বগুড়া জেলা মোট ১২টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং বর্তমান বগুড়া জেলা তথা ২৪°৩২′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৫°৩৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°৪৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ২,৯১৯.৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকা[২৩] এ গবেষণার পরিধিভুক্ত।

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন কৃষি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কৃষিকাজে, সে যুগের সেচ, সার, বাঁধ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির অপ্রতুলতায় জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও দৈবের ওপর নির্ভর করা এবং সৃষ্টিকর্তার আশির্বাদ প্রার্থনা করার বিকল্প ছিলো না। ফলে কৃষিনির্ভর সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান চাষাবাদ ও ফসলকে কেন্দ্র করে পালিত হয়ে আসছে।[২৪] কৃষি-অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি, যেমন- কৃষিকার্যের উপকরণ, শস্য ও ফসল, আবহাওয়া, কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, ফসল বা শস্য উৎসব, বাজার ব্যবস্থাপনা, কৃষির সাথে বৃক্ষ, পশু ও মৎসের সম্পর্ক, কৃষি সম্পৃক্ত ধর্ম ও উপাসনা ইত্যাদি এদেশের বিভিন্ন লোকসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।[২৫]

কৃষিভিত্তিক সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে কৃষি-অর্থনীতির যুগপৎ সম্পর্ক দৃশ্যমান। বাংলাদেশের একটি কৃষি-অর্থনীতির ঐতিহ্য সম্বলিত জনপদ বগুড়াও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। বগুড়া জেলার জনগোষ্ঠীর সাথে কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর লোকজ উৎসবের সম্পর্ক সৃষ্টিতে বিভিন্ন অনুঘটক উপাদান ক্রিয়াশীল। বর্তমান গবেষণায় বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উৎসবের মধ্যে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্কিত উৎসবসমূহ নির্ধারণে বগুড়া জেলায় প্রচলিত লোকজ উৎসবসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বগুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোকজ উৎসবের মাঝে ১০টি উৎসবে বিভিন্নভাবে কৃষি-অর্থনীতির উপাদানের সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। ১০টি উৎসবের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বগুড়া জেলার জনগোষ্ঠীর সাথে কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর লোকজ উৎসবের সম্পর্কের অনুঘটক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো– কৃষি উৎপাদনপরবর্তী ফসল সংগ্রহ, ফসল ব্যবসায় হালখাতা, ঋতুভিত্তিক সময় বিবেচনায় নতুন কৃষি-পণ্য লাগানো, কৃষি-পণ্যের বাজার, কৃষক-শ্রমিক-প্রতিবেশীদের সমন্বয়ে উৎসব, বৃক্ষরোপণ ও মৎস্য আহরণকেন্দ্রিক উৎসব ইত্যাদি। সর্বোপরি, বগুড়ার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও লোকজ উৎসবগুলো একে অপরের পরিপূরক। কৃষি, ঋতুচক্র, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামাজিক সংহতি, লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস এসব উপাদান একত্রে মিলে এই অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতি ও লোকজ উৎসবের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করেছে। সুতরাং, বগুড়ার কৃষি-অর্থনীতি ও লোকজ উৎসব পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যেখানে কৃষি উৎপাদন, সামাজিক সম্প্রীতি, বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মিলিত হয়ে একটি প্রাণবন্ত উৎসবের রূপ নেয়। নিম্নে লোকজ উৎসবসমূহ পর্যালোচনায় এর সাথে কৃষি-অর্থনীতির প্রভাব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. বৈশাখী উৎসব

অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বগুড়া জেলার প্রায় সর্বত্র পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ দিন বৈশাখী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বগুড়া শহরের সাতমাথায় বগুড়া থিয়েটার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে মঙ্গল শোভাযাত্রার হয়ে থাকে। মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাতি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, গরুর গাড়ি, পালকি, লাঙ্গল- জোয়াল কাঁধে কৃষক, রাখাল, গৃহিণী, জমিদার, লাঠিয়াল, রাজা-প্রজা, বিভিন্ন মুখোশ- যেমন- বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি সহযোগে ঢাক, ঢোল, খরতাল, বাঁশি, কাঁসার শব্দে নৃত্য-গীতের তালে তালে শোভাযাত্রা পুরো শহর ঘুরে পৌরপার্ক বা সাতমাথায় এসে শেষ হয়।[২৬] মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকজন

নতুন বৈশাখী পোশাক পরে (ছেলেরা পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মেয়েরা বৈশাখী শাড়ি) দলে দলে অংশগ্রহণ করে একটি সর্বজনীন উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বৈশাখী উৎসব হলো বাংলা সনের প্রথম দিন তথা বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের আয়োজন। বাংলা নববর্ষের উদ্ভাবক হিসেবে ইতিহাসে বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, কেউ কেউ বাংলার স্বাধীন নরপতি শশাঙ্ক (৬০৩-৬৩৫খ্রি.), আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) এবং সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করে থাকেন।[২৭] বিভিন্ন মতামত থাকলেও সম্রাট আকবরকে বাংলা সনের প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তথা বাংলা নববর্ষ বা বাংলা সন শুরু করেছিলেন সম্রাট আকবরই। খাজনা আদায়সহ ফসলের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পালা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ ও তিথি অনুযায়ী করার সুবিধার্থে সম্রাট আকবরই প্রথম বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[২৮] একটা সময় নববর্ষ পালিত হতো উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ঋতুনির্ভর কৃষির। এই কৃষিকাজের সুবিধার্থেই ফসল উৎপাদনের ঋতুচক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন-আরোহণের সময় থেকে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)। হিজরি চন্দ্রসন ও বাংলা সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন এ সনটি প্রথমে 'ফসলি সন' নামে পরিচিত ছিল, পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়।[২৯] সম্রাট আকবরের শাসনামলে গ্রাম ও কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশের রাজস্ব আদায় হতো তখন ফসল থেকে। সে কারণে চৈত্র-বৈশাখের বড় দিন এবং শুষ্ক পথ-ঘাট কর আদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। তাই বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে নতুন সনের উদ্ভব ঘটে। পহেলা বৈশাখের সময় কৃষি, কৃষক, অর্থনীতি এবং ব্যবসা কেন্দ্র করে উৎসবের পাশাপাশি নতুন বছরের নতুন ধান ঘরে তোলার পর শস্য সম্পদে সমৃদ্ধ কৃষকরা নানা পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে নদীতীরে, বৃক্ষছায়ায় অথবা পাহাড়ের পাদদেশে মিলিত হতেন। এভাবেই একসময় গ্রামীণ অর্থনীতিতে যুক্ত হয় মেলা।[৩০]

পহেলা বৈশাখে কৃষিজীবী সমাজ নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে। ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' উদযাপন করেন, যেখানে কৃষিপণ্যের কেনাবেচার হিসাব গুছিয়ে নতুন বছরে উন্নত চাষাবাদের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনে বৈশাখী উৎসবের সাথে মঙ্গল শোভাযাত্রা, পান্তা-ইলিশ, মেলা ইত্যাদি সংযুক্ত হলেও কৃষি-অর্থনীতির উপাদান বৈশাখী হালখাতা আজও বৈশাখী উৎসবের অংশ হয়ে আছে, যা এ উৎসবটি উৎপত্তিগতভাবে এবং প্রায়োগিকভাবে কৃষি-অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত থাকার পরিচয় বহন করে।

২. নবান্ন উৎসব

বগুড়ার হিন্দু ও মুসলিম সমাজে ভিন্ন ভিন্নভাবে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। হিন্দু সমাজে নবান্নের দিন সকালে স্নান করে বাড়ির ছোট ছেলেকে নিয়ে বয়োজেষ্ঠ্য কোন ব্যক্তি গামছায় বা লাল সালু কাপড়ে করে আতপ চাল, গুড়, কলা, আগরবাতি, কাস্তে, পুরা ফুল, সিঁদুর, কাজল, শঙ্খ ইত্যাদি নিয়ে জমিতে যায় আখ কেটে আনার জন্য। এরপর নির্দিষ্ট জমির উত্তর পূর্ব কোণ দিক থেকে তিন গোছ ধান গাছকে এক সাথে দিয়ে বেধে তার সাথে আনা উপাচারগুলো দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করে। পূজা শেষে প্রণাম করে তা কেটে ঐ ছোট ছেলের মাথায় মুড়িয়ে ছেলেটিকে বাড়িতে পাঠানো হয়, বাড়িতে আসার পথে সে কারো সাথে কথা বলে না। বাড়িতে আসার পর তাকে

'পরছা' (উলু ধ্বনি সহযোগে বিশেষ ক্রিয়া) দিয়ে বরণ করা হয়। এদিন বাড়ির পুরুষরা পুকুর থেকে সবচেয়ে বড় মাছ ধরে অথবা বাজার থেকে বড় মাছ কিনে আনে, নারীরা ঘরের ভিতর, বারান্দায়, আঙিনায় বিভিন্ন রকম আলপনা আঁকে এবং নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করে। মুসলমান সমাজেও নবান্ন উৎসব পালিত হয়, মুসলিমরা এ দিন নতুন চালের পায়েস রান্না করে মসজিদে সিন্নি দেয়।[৩১] সর্বোপরি, নবান্ন উৎসব বগুড়ায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে পালন করে থাকে।

নবান্ন শস্যভিত্তিক একটি লোক-উৎসব। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন বা নব অন্ন। নবান্ন উৎসব হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব।[৩২] কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ঋতুতে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ কিংবা মাঘ মাসে গৃহস্থরা এ উৎসব পালনে মেতে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওয়াজিরাবাদে নবান্ন উৎসব পালিত হয় বৈশাখ মাসে। সেখানে রবিশস্য গম ঘরে তোলার আনন্দে এ বৈশাখী নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। বাংলাদেশের সাঁওতালরা পৌষ-মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তুলে উদ্‌যাপন করে সোহরায় উৎসব।[৩৩] সাধারণত নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা-পায়েস তৈরি এবং আত্মীয়দের মাঝে আদান-প্রদান নবান্নের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মে এ দিন ফসলের মাঠে পূজা-অর্চনা করে থাকে।[৩৪]

নবান্ন উৎসবের সাথে হিন্দু ধর্মের রীতির সম্পৃক্ততা থাকলেও উৎপত্তিগতভাবে এর সাথে নতুন ফসলকে বরণ করে নেওয়ার রীতিও লক্ষণীয়। বর্তমানে প্রায়োগিকভাবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে নবান্ন পালন করা হয়ে তাকে। বর্তমানে এ উৎসবের আমেজে কিছুটা ভাটা পড়লেও একটি লোকজ উৎসব হিসেবে কৃষক পরিবারে এ উৎসব আজও বিদ্যমান। বগুড়ার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। বগুড়ায় উৎপাদিত ধান, আলু, গমসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের সঙ্গে নবান্ন উৎসবে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

৩. পৌষপার্বণ

বগুড়া জেলায় পৌষপার্বণকে 'পুশনে' বলা হয়। এদিন গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিতে ঘুঙুর লাগিয়ে মাগনের গান বা ছড়া গেয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগন তোলে। এই আয়োজন শুরু হয় পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে এবং চলে মাসের শেষ দিনের আগ পর্যন্ত। পৌষের শেষ দিন, গ্রামের ফাঁকা মাঠে সংগৃহীত মাগন দিয়ে ক্ষীর ও খিচুড়ি রান্না করা হয়, যেখানে গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে আনন্দঘন পরিবেশে খাওয়া-দাওয়া করে।[৩৫]

পৌষসংক্রান্তি হিন্দুদের একটি ধর্মীয় পর্ব। প্রাচীন কাল থেকেই দেবতার পূজায় পিঠার অর্ঘ্য প্রদানের রীতি রয়েছে। এই দিনটি হিন্দু পঞ্জিকায় 'মকর সংক্রান্তি'[৩৬] বা 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি'[৩৭] নামেও পরিচিত। প্রাচীন হিন্দুরা এই দিনটিতে পিতৃপুরুষ অথবা বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে তিল কিংবা খেজুড় গুড় দিয়ে তৈরি তিলুয়া এবং নতুন ধান থেকে উৎপন্ন চালের তৈরি পিঠের অর্ঘ্য প্রদান করতেন। এই কারণে পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম 'তিলুয়া সংক্রান্তি' বা 'পিঠে সংক্রান্তি'। এই প্রাচীন উৎসবের একটি রূপ অদ্যাবধি পিঠেপার্বণের আকারে বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত।[৩৮] পৌষ মাসের শেষ দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে নবান্নও হয়। এ উপলক্ষে ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার আয়োজন করা

হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নতুন ফসলের আগমন উপলক্ষে পৌষমেলার প্রবর্তন করেন; এখনও কয়েকদিন ধরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৩৯]

কৃষিজীবী সমাজের জন্য গ্রীষ্মের শেষে শীতের আগমন নতুন কৃষি চক্রের সূচক। উৎপত্তিগত ও ব্যবহারিকভাবে পৌষপার্বণের সাথে কৃষি-অর্থনীতির অন্যতম দিক ফসল উত্তোলনের সাথে সম্পর্ক দৃশ্যমান। কৃষিজীবী সমাজে উৎসবগুলোর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফসল কাটার সময় পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন একসঙ্গে কাজ করে এবং উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। বিশেষত পৌষপার্বণে গ্রামের সকলে মিলে খাওয়ার আয়োজনকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক সংহতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এভাবে কৃষি, উৎসব, সংস্কৃতি একে অপরকে আলিঙ্গন করে নেয়। এভাবে উৎসবের মাঝে কৃষি-অর্থনীতির প্রভাব সমাজে ফুটে ওঠে।

৪. গাবতলী পোড়াদহ মেলা উৎসব

প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বুধবার একদিনের জন্য এ মেলা বসে। মেলার আগের দিন সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো হয়, তাই এর মেলার আরেক নাম সন্ন্যাসীর মেলা। হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোকই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উপলক্ষ করে মানত করে। বাংলার ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভবানীপাঠক এই মেলা প্রতিষ্ঠা করেন বলে স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি রয়েছে।[৪০]

এ মেলার প্রধান আকর্ষণ মাছ। সে কারণে অনেকেই এ মেলাকে 'মাছের মেলা' বলে থাকেন। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন জাতের মাছ। বুধবার ভোর হতে না হতেই আড়তে আনা হয় বড় বড় মাছ। আর ভোর থেকেই আড়তে আড়তে ছুটে যান খুচরা ব্যবসায়ীরা। চাহিদা অনুযায়ী তারা মাছ কেনেন। রুই, কাতলা, বাঘাইড়, মৃগেল, বোয়াল, সিলভার কার্প, বিগহেড, কালিবাউস, পাঙ্গাসসহ বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া যায় এ মেলায়। মেলায় আগে দুই থেকে আড়াই মণ ওজনের বাঘাইড়ও পাওয়া যেত। এখন পাওয়া যায় ১৫ থেকে ২০ কেজি ওজনের রুই, কাতলা, পাঙ্গাস।[৪১]

এ মেলার উৎপত্তির সাথে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে পূজা উৎসবের পাশাপাশি বড় বড় মাছ কেনা-বেচার একটি মিলনমেলা হিসেবে এটি বিবেচিত। প্রতিবছরের এ মেলা বড় মাছ প্রাপ্তির উৎসাহ ও আমেজ সৃষ্টি করে, যা কৃষি-অর্থনীতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এ মেলার মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন একসঙ্গে সামর্থ অনুসারে মাছ কিনে নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। কৃষি-অর্থনীতিতে থাকা পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, জীবিকা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়াদি এ মেলা উৎসবে প্রতিয়মান। একই সাথে এ মেলা একটি বিশেষ বাজার ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি করে, যা কৃষি-অর্থনীতি বিবেচনায় কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই নির্দেশ করে।

৫. খারুয়া দহের খাউরো মেলা

'খারুয়া দহের খাউরো মেলা' বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি প্রাচীন লোকজ মেলা। প্রতি বছরের ফাল্গুনের প্রথম বুধবারে বগুড়া শহর হতে ১৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে জালশুখা গ্রামের খারুয়া দহ নামক স্থানে এ মেলা বসে। কথিত আছে বগুড়ার গাবতলী উপজেলার পোড়াদহে বড় সন্ন্যাসীর পূজা হতো আর শাজাহানপুরের খাউড়া জানের কিনারায় শ্মশান এলাকায় বৃহদাকার বটগাছের নিচে হতো ছোট সন্ন্যাসীর পূজা। আর এ সন্ন্যাস পুজাকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল খাউড়া মেলা। কালের আবর্তে সন্ন্যাস পূজা বন্ধ হলেও আজও বসছে মেলা। মেলা থেকে কেনা বড় বড় মাছ, গরু

ছাগল কিংবা মহিষের গোস্ত, ফাগুনের মিষ্টি বড়ই, হরেক রকমের মিষ্টান্ন দিয়ে চলছে নাইওরি আপ্যায়ন। মেলার প্রধান আকর্ষণ থাকে বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় মাছ। বিশেষ করে বাঘাইড়, বোয়াল, কাতলা, রুই, ব্রিগেড, সিলভার মাছ।[৪২]

খারুয়া দহের 'খাউরো' মেলায় মৎস্য একটি প্রধান পণ্য। এ মেলার উৎপত্তির সাথে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে পূজা হয় না; বরং এ মেলায় বড় বড় মাছই প্রধান আকর্ষণ হয়ে থাকে। মৎস্য কৃষির একটি প্রাচীন উপাদান। এ মেলাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ মৎস্য আহরণ ও বিপণন লক্ষ করা যায়। কৃষি-অর্থনীতির উপাদান মৎসকেন্দ্রিক এ মেলা কৃষি-অর্থনীতির বাহক হিসেবেই বিবেচিত। সর্বোপরি, বগুড়া জেলার কৃষি-অর্থনীতিতে এ মেলার প্রভাব প্রতীয়মান হয়। মাছ কেনা-বেচাকে কেন্দ্র করে এ মেলা আয়োজিত হলেও এ মেলায় থাকে লোকসংগীত, পালাগান, গম্ভীরা, লাঠিখেলা ও গ্রামীণ মেলার মতো বিনোদনমূলক কার্যক্রম, যা কৃষিভিত্তিক সমাজে আনন্দের মাত্রা যোগ করে। বাজার প্রচার কৃষি অর্থনৈতিক একটি অন্যতম উপাদান, খারুয়া দহের খাউরো মেলার মাধ্যমে মূলত মৎস্য বিপণনকে কেন্দ্র করে একটি নতুন বাজার ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়।

৬. গোছআকা বা রাখা উৎসব

বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপজেলার হিন্দু সমাজের একটি অন্যতম কৃষিভিত্তিক লোকাচার হলো গোছআকা বা রাখা। এ উৎসবটি শ্রাবণ মাসে প্রথম যেদিন জমিতে আমন ধান লাগানো সেদিন করা হয়। প্রথমে জমির মালিক তার নিজের জমিতে কয়েকটি গোছ দিয়ে ধান লাগানো শুরু করেন এবং বাড়িতে নানা রকমের খাবারের আয়োজন করেন।[৪৩] এ উৎসবে কৃষক, জমির মালিক এবং প্রতিবেশীরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন।

উৎপত্তিগতভাবেই এ উৎসবটির সাথে কৃষির সম্পর্ক রয়েছে, বর্তমানেও ব্যবহারিকভাবে এ উৎসবে কৃষির সম্পৃক্ততা দৃশ্যমান। এটি ঋতুভিত্তিক একটি উৎসব, এ উৎসবের সাথে রয়েছে কৃষি কার্যক্রমের সম্পর্ক। এ উৎসব ফসল বপণ করাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, যাতে মালিক, শ্রমিক এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা একত্রে আনন্দ ভাগাভাগি করে।

৭. গাই দেওরান উৎসব

বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার সনাতন ধর্মালম্বীরা তাদের বাড়িতে কোন গরুর বাছুর হলে গাই দেওরান উৎসব না করা পর্যন্ত বাড়ির কোন সদস্য ঐ গরুর দুধ খায় না। বাছুর জন্মের ৭ দিন বা প্রথম সপ্তাহের প্রথম রবিবার বাছুর জন্ম দেয়া গাইকে গোসল করানোর পর বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বিশেষ আচার পালনের মাধ্যমে গাই দেওরান উৎসব পালন করে।[৪৪]

আদিকাল থেকে পশু বিশেষত গরু-মহিষ কৃষি কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই গরুর বাছুর হলে কৃষক খুবই আনন্দিত হয়। এ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হলো এ উৎসব। এ উৎসব একটি লোকাচার হলেও এর সাথে কৃষির উপাদান পশুপালনের সম্পর্ক ফুটে উঠে। সর্বোপরি, কৃষির সাথে ধর্মীয় আচারের সম্পর্ক এ উৎসবে ফুটে উঠে।

৮. গোয়াল পূজা উৎসব

বগুড়া জেলার হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে আষাঢ় মাসের ৭দিন গেলে আমুত (অম্বসূচি) লাগে। এই আমুত আড়াই দিন থাকে। এই আড়াই দিনের শেষ দিনেই গোয়াল পূজার আয়োজন করা হয়। পূজায় গরু-বাছুরের মঙ্গল কামনায় মন্ত্র যপ করা হয়। বিশেষ আচার পালনের মাধ্যমে আমুত দূর করতে পূজার ফুলগুলো গোয়ালের দরজায় মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। কৃষকের গোয়াল ঘরের দেবতা গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে এ পূজা করা হয়।[৪৫]

কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফসলের সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকাচার প্রচলিত। গোয়াল পূজা উৎসব কৃষি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সংযোগ ঘটায়। এ উৎসবটি উৎপত্তিগতভাবেই কৃষি-অর্থনীতির অনুষঙ্গ পশুপালনের সাথে সম্পর্কিত।

৯. মুঠ আকা (রাখা) উৎসব

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় প্রচলিত একটি লোকজ কৃষি আচার হলো মুঠ আকা বা রাখা। ফাল্গুন মাসে জমিতে প্রথম কাউন ছিটানোর দিন এ উৎসব পালিত হয়। এর আগের রাতে আতপ চাল পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং লাউ, লবণ, মরিচ, তেঁতুল ও গুড় দিয়ে খাট্টা ও ক্ষীর রান্না করা হয়। সকালে গুড়-মেশানো ভেজা চাল কলাপাতায় মেখে কৃষক ও সহযাত্রীরা একসঙ্গে খান এবং হালের গরুকেও সামান্য চাল ও গুড় খেতে দেওয়া হয়।[৪৬]

এ আচারটি অনেকাংশে কৃষকদের প্রথাগত সংস্কৃতি। এটি মূলত প্রথম ফসল লাগানোর খুশি সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি উপলক্ষ। নিজেদের জন্য প্রস্তুত খাবার হালের গরুকে খাওয়ানো হয় এজন্য যে, তাদের বিশ্বাস তাদের ফসল উৎপাদনে হালের গরুরও অবদান রয়েছে। সর্বোপরি, এ আচারে কিছুটা কুসংস্কারের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। এ উৎসবটি উৎপত্তিগতভাবেই কৃষি ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পালিত হয়।

১০. গাছ-বিয়ের উৎসব

গাছের সাথে গাছের বিয়ের প্রচলন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের একটি রীতি। হিন্দু মতে বট-পাকুড়ের বিয়ে হলে গ্রামে মঙ্গল হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিয়ে উৎসবের প্রচলন রয়েছে। বগুড়া জেলায়ও এ ধরনের বিবাহ উৎসবের প্রচলন রয়েছে।[৪৭] বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় বহুল প্রচলিত এক অনন্য লোকজ আচার ছিল গাছের বিয়ে। এখানে বটগাছ ছিল বর আর পাকুড় গাছ ছিল কনে। বরকে ধুতি ও কনেকে শাড়ি মুড়িয়ে বিয়ের আয়োজন হতো, যেখানে ঢোল-বাদ্যের সঙ্গে হাজারো মানুষ অংশ নিতো। এছাড়াও, নিষ্ফলা বৃক্ষের সঙ্গে ফলদ বৃক্ষের বিয়ে দেওয়া হতো। আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে ১০-১২ বছরের ছেলেরা কুড়াল হাতে নিষ্ফলা গাছ কাটতে উদ্যত হলে, অন্যরা বাধা দিয়ে বলতো, "কাটিস না, বিয়ে দে"। এরপর গাছের গোড়ায় ছোট কোপ দিয়ে পাশের ফলদ বৃক্ষের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো। বিয়ে শেষে সবাই খই, মুড়ি, গুড়ের পায়েস খেতো। বর্তমানে কিছু গ্রামে ক্ষীণ আকারে এ উৎসব পালিত হয়।

কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফসলের সমৃদ্ধির জন্য যেসকল উৎসব প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে 'গাছ বিয়ের উৎসব' অন্যতম। এ উৎসবটি স্থানীয় লোকাচার হলেও এর উদ্দেশ্য হলো বৃক্ষের ফলন বৃদ্ধির জন্য দেবতার আশীর্বাদ কামনা। ফলজ বৃক্ষ কৃষির একটি উপাদান। এ হিসেবে এই উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার

বগুড়া জেলার লোকজ উৎসব এবং কৃষি-অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যের অংশ, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় কৃষির উৎপাদন, বিপণন ও খাদ সংস্কৃতির সাথে বিভিন্ন লোকজ উৎসবের যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান, তা বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বগুড়া জেলায় প্রচলিত লোকজ উৎসবসমূহ পর্যালোচনায় ১০টি উৎসবে বিভিন্নভাবে কৃষি-অর্থনীতির উপাদানের সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। নববর্ষ, নবান্ন, পৌষপার্বণ, গাবতলীর পোড়াদহ মেলা, খারুয়া দহের খাউরো মেলা, গোছ আকা বা রাখা, গাই-দেওরান, গোয়াল পূজা উৎসব /গোরক্ষনাথের পূজা, মুঠ আকা (রাখা), হুদমা দেও উৎসব ও গাছ বিয়ের উৎসব মতো উৎসবগুলো কৃষিভিত্তিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফসল তোলা ও নতুন ফসলের আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ উৎসবগুলো শুধুমাত্র বিনোদনমূলক নয়; বরং কৃষির উন্নয়ন, কৃষিজীবী মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক সংহতির প্রতিফলন ঘটায়। তবে আধুনিকায়নের ফলে কৃষিভিত্তিক অনেক উৎসবের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, যা স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, কৃষি এবং লোকজ উৎসবের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে হলে ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলোর সুরক্ষা ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের উচিত কৃষিনির্ভর উৎসবগুলোকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কৃষি-অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত উৎসবগুলোকে সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে এ সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা সম্ভব। সর্বোপরি, বগুড়া জেলার কৃষি ও উৎসবের এ সংযোগ কেবল ঐতিহ্যগত নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা, যা ভবিষ্যতে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

তথ্যনির্দেশ

১ *Agriculture Census 2019: District Report Bogura* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2019), p. xxx, 32; *Agriculture Census 2008* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2008), p. 39

২ শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : বগুড়া* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ২৪৪-২৮২

৩ সৌমিত দে রায়, 'বাংলার উৎসব ও শ্যামা পোকা: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সাংস্কৃতিক কাহিনী', *মরশুম ভিত্তিক কৃষি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক পুস্তক*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৪৩১, পৃ. ৩৩-৩৫

৪ মো. সালেহ মাহমুদ, 'ভাত ও বাঙালি: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ছত্রিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৫/ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬৫-২৬৬

৫ শিপ্রা ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক উৎসব ও লোক খাদ্য', Dr. Nilendu Chatterjee (Editor), *Indian Knowledge Systems:Heritage, Contemporary Relevanceand Future Pathways* (India: Levant Books, 2024). p. 428-440

৬ মো. হাবিবুল্লাহ, '*কৃষি-পরাশর*-এ প্রাচীন বাংলার কৃষি', *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০, পৃ. ১৩৬-১৪৯

৭ মো. মতিয়ার রহমান রচিত, 'বাংলা নববর্ষ : বাঙ্গালির সার্বজনীন জাতীয় উৎসব', *Banglavision Research Journal*, Vol. 18, No. 1, November 2018, pp. 108-117

৮ Rajat Gupta, Ishan Bakshi and Prashant Gautam, 'Determining the Impact of Attributes of Haryanvi Festival Food on Tourist Attraction', *Current Journal of Applied Science and Technology,* Volume 42, Issue 48, 2023, Pp. 120-128

৯ Sri Najiyati and others 'Social Investment Through A Collaborative Village Festival: The Case of Farmers' Village Festival in Jogjakarta', *SAGE Open,* October-December 2024, p. 1-22

১০ D. Getz, T. Andersson & J. Carlsen, 'Festival management studies', *International Journal of Event and Festival Management,* voll-1(1), p. 29–59

১১ মুনতাসীর মামুন, 'উৎসব', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title= উৎসব, সংগ্রহের তারিখ: ১২/১/২০২৫

১২ প্রাগুক্ত

১৩ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১০৬১

১৪ Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, *The Journal of American Folklore,* Voll. 84 (331), p. 13

১৫ শিপ্রা ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

১৬ মোমেন চৌধুরী, 'লোকউৎসব', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title= লোকউৎসব, সংগ্রহের তারিখ: ০২/০৫/২০২৫

১৭ মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। মেলায় একে অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় হয়। মেলা সাধারণ কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে, কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব, কোন বিশেষ দিন অথবা বর্ষবরণ, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। [মোঃ ইয়ামিন খান, 'লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজন উৎসব '৯৬ এর বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য', *লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ প্রতিবেদন* (নারায়ণগঞ্জ: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭), পৃ. ৯] লোক সমাজে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে নিজস্ব পরিকাঠামোয় যে মেলা পরিচালিত হয় তাই লোক মেলা। লোক-উৎসব এবং লোকমেলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সাধারণত লোক-উৎসব মাত্রই লোকমেলার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। যেমন- নববর্ষ ও বৈশাখী মেলা, নবান্ন ও পৌষমেলা। মেলা বাংলাদেশের লৌকিক ও জনপ্রিয় উৎসব। এদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে মূলত গ্রাম-সংস্কৃতি হতে। এদেশের প্রাচীন পর্যায়ের উৎসব ও কৃত্যানুষ্ঠানকেন্দ্রিক মেলাগুলির মধ্যে প্রথমেই আসে জীবনধারণের আহার্য কৃষিশস্য এবং বিশেষ করে কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রোদ ও বৃষ্টির কথা। [সাইমন জাকারিয়া, 'মেলা', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title= মেলা, সংগ্রহের তারিখ: ০২/০৫/২০২৫] তাই বর্তমান গবেষণায় লোকজ উৎসবের সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক পর্যালোচনায় লোক মেলাসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১৮ মানব জীবন প্রবাহের প্রতিটি স্তরে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও শোক-তাপের আশঙ্কা থাকে। বিপদমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনের কামনা-বাসনা থেকে মানুষ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন আচার-প্রথা গড়ে তুলেছে, এগুলোকে লোকাচার বলা হয়। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি লোকাচার বা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানেরও প্রচলন আছে। আচারের মূলে আছে প্রধানত অন্ধ ও অলৌকিক বিশ্বাস ও নানা সংস্কার। আচারগুলোর উপলক্ষ, আয়োজন, উপাদান, কৃত্যানুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে আদিবাসীর সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে বেশ মিল পরিলক্ষিত হয়। [ওয়াকিল আহমদ, 'লোকাচার', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title= লোকাচার, সংগ্রহের তারিখ: ০২/০৫/২০২৫]

১৯ Dr. A. T. M. Shamsuzzoha, "The Portrayal of Agriculture and Farmers in the Medieval Bengali Literature", *The Arts Faculty Journal centennial issue* (Dhaka: University of Dhaka, 2022), pp. 74-90

২০ আসহাবুর রহমান, *বাঙলাদেশের কৃষিকাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ১-৩০

২১ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, voll-VIII, District of Rajshahi and Bogra* (London: Trubner & Co., 1876), p. 130; শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৮; শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

২২ বিগ্রেডিয়ার এম. মাসাহেদ চৌধুরী (সম্পা), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার-বগুড়া* (ঢাকা: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৯), পৃ. ১

২৩ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, *ইতিকথা বগুড়া* (বগুড়া: সবুজ নার্সারী, ২০২০), পৃ. ১৫-১৬

২৪ ওয়াকিল আহমদ, 'লোকাচার', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=লোকাচার, সংগ্রহের তারিখ: ১৫/১/২০২৫

২৫ অরিজিৎ কুমার, *নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত: বাংলা লোকসাহিত্য* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৮

২৬ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার : বগুড়া* (ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০১৭), পৃ. ৮৩; শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫

২৭ শামসুজ্জামান খান, 'বৈশাখি লোক-উৎসব-১৪০০', *বাংলা চতুর্দশ শতক: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ১৯৯৩, পৃ. ২

২৮ মো. মতিয়ার রহমান রচিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৯ সমবারু চন্দ্র মহন্ত, 'পহেলা বৈশাখ', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=পহেলা বৈশাখ, সংগ্রহের তারিখ: ১৩/১/২০২৫

৩০ আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ, 'পহেলা বৈশাখ: কৃষির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির সংশ্লেষ', *বণিত বার্তা*, দেওয়ান হানিফ মাহমুদ (সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলাদেশ, ১৫ এপ্রিল, ২০২৪, সম্পাদকীয় কলাম

৩১ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭; শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭

৩২ ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (কলকাতা: আকাদেমি অফ ফোকলোর, ২০০৪), পৃ. ৩২১-২২

৩৩ মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীর, 'নবান্ন', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=নবান্ন, সংগ্রহের তারিখ: ১৪/১/২০২৫

৩৪ প্রাগুক্ত

৩৫ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭; শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৩৬ মকর রাশিচক্রের দশম রাশির নাম। মকর সংক্রান্তি বলতে জোতিশাস্ত্রে সূর্যের মকররাশিতে গমন। এটি বাংলা মাঘ মাসের শেষ দিন। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ৯৪৩] সংক্রান্তি বলতে সূর্য ও গ্রহাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমনকে বুঝায়। এছাড়াও মাসের শেষ দিনকেও সংক্রান্তি বলে। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯৮] হিন্দু ধর্মবিশ্বাসানুসের সূর্যের রাশিচক্রে ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের চিহ্ন হিসেবে এ দিবস পালন করা হয়। [Kamal Kumar Tumuluru, Hindu Prayers, Gods and Festivals (*Haryana:* Partridge Publishing India, 2015), p. 30] অর্থাৎ, এটি এমন একটি দিন যেদিন ধনু রাশি শেষ হয়ে মকর রাশি শুরু হয়, তথা মাঘ মাসের শেষ দিন।

৩৭ উত্তরায়ণ বলতে বিষুবরেখা থেকে সূর্যের ক্রমশ উত্তরে গমন (মাঘের সূর্য উত্তরায়ণ পার হয়ে আসা)। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫] বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলের জন্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি তথা উত্তরায়ণের শেষ দিন হিসেবে ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ হয়ে থাকে। তবে এটি ব্যবহারিক অর্থে পৌষ মাসের শেষ দিনকে বুঝানো হয়।

৩৮ ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

৩৯ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পৌষসংক্রান্তি', *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪), অনলাইন ভার্সন, https://bn.banglapedia.org/index.php/পৌষসংক্রান্তি, সংগ্রহের তারিখ: ১৪/১/২০২৫

৪০ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪; শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

৪১ কাওছার উল্লাহ আরিফ, 'রাত পোহালেই বসছে চারশ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'পোড়াদহ' মেলা', *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৫

৪২ https://www.dailykaratoa.com/article/117712, publish Date: 19/02/2025, Search on Date: 02/03/2025

৪৩ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০; শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০; শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

৪৫ শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯ ও ২৭০

৪৬ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১; শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৪৭ '৫০০ অতিথির আগমনে বট-পাকুড়ের বিয়ে', *জাগো নিউজ২৪ ডটকম*, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, https://www.jagonews24.com/country/news/738420, সংগ্রহের তারিখ: ১৫/১/২০২৫